

বিশ্বাস ও বিজ্ঞান

বিশ্বাস ও বিজ্ঞান

সম্পাদক মণ্ডলী
ড. অভিজিৎ রায়
শহিদুল ইসলাম
ফরিদ আহমদ

সভাপতি
অজয় রায়

মুক্তমনা ও শিক্ষা আন্দোলন মঞ্চ

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০১২

প্রচ্ছদ
বিপ্লব মন্ডল

প্রকাশক
চারদিক

৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১১১০৬৯, ৯৫৬৪৭৯৯

মুদ্রণ
ইমপ্রেসন প্রিন্টিং হাউস
২২ আলমগঞ্জ লেন, ঢাকা-১২০৪
ফোন : ৭৪৪০৯৩৬

ISBN : 984 802 077 2

মূল্য : ৫২০.০০ টাকা

বিশ্বে, বিশেষ করে বাংলার সব
মুজুমনা মানুষের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধার্ঘ

সূচিপত্র

আমাদের কথা ৯-১৬

প্রথম অধ্যায় : বিশ্বসৃষ্টির আদি কারণ

- ঈশ্বর কি সৃষ্টির আদি কারণ ? - ড. অভিজিৎ রায় ১৯-২৫
বিজ্ঞান ও ধর্ম - ড. আলবার্ট আইনস্টাইন ২৬-৩২
আইনস্টাইনের মহাজাগতিক ধর্ম ও অন্যান্য প্রসঙ্গ - ড. রিচার্ড ডকিস ৩৩-৪৩
স্বাধীন ইচ্ছা ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব - অপার্টিব জামান ৪৪-৪৭
সংশয়ীদের ঈশ্বর - আহমাদ মোস্তফা কামাল ৪৮-৬১
মহাবিশ্ব এবং ঈশ্বর-একটি বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনা - ড. অভিজিৎ রায় ৬২-৮৯
বিজ্ঞানের ধর্ম ও ঈশ্বর প্রসঙ্গ - ড. অজয় রায় ৯০-১২৯

দ্বিতীয় অধ্যায় : সর্বজ্ঞ-সর্বশক্তিমান সত্তার সন্ধান

- বিজ্ঞান কি ঈশ্বরকে খুঁজে পেয়েছে ? - ড. ভিক্টর জে স্ট্রেঙ্গার ১৩৩-১৩৯
পরিকল্পিত মহাবিশ্ব ? - ড. স্টিভেন ওয়েইনবার্গ ১৪০-১৪৯
ঈশ্বরের অস্তিত্ব-সৃষ্টির যুক্তির খন্ডন - অপার্টিব জামান ১৫০-১৫৫
স্রষ্টা ও ধর্ম-অসঙ্গতির প্রসঙ্গ - সৈকত চৌধুরী ১৫৬-১৬৩
অপরিপক্ক নকশা - ড. অভিজিৎ রায় ১৬৪-১৭২
বুদ্ধিমত্তা নকশা ও বিজ্ঞান - বন্যা আহমেদ ও ড. অভিজিৎ রায় ১৭৩-২০৭
আস্তিকতা বনাম নাস্তিকতা - মেজবাহ উদ্দিন জওহের ২০৮-২২৪

তৃতীয় অধ্যায় : বিজ্ঞান ও বিশ্বাসের সহাবস্থান

- বিজ্ঞান মনস্কতা ও ধর্মবোধ - ড. ইরতিশাদ আহমদ ২২৭-২৪৭
ঈশ্বর-বিশ্বাস ও ধর্মচেতনা - ওয়াহিদ রেজা ২৪৮-২৬৬
বিশ্বাস ও বিজ্ঞান - ড. প্রদীপ দেব ২৬৭-২৭৬
বিবর্তনের দৃষ্টিতে সৃষ্টিতত্ত্ব - দিগন্ত সরকার ২৭৭-২৯৮
স্বতন্ত্র বলয় - ড. স্টিফেন জে গুল্ড ২৯৯-৩১৩
বিজ্ঞানের অঙ্গনে যখন ধর্মের প্রবেশ - ড. রিচার্ড ডকিস ৩১৪-৩১৯

- বিজ্ঞান ও ধর্ম : মার্কসবাদের দৃষ্টিতে - শঙ্কর রায় ৩২০-৩২৪
ধর্ম ও বিজ্ঞানের সহাবস্থান - মো: জানে আলম ৩২৫-৩৩০
ধর্মের স্বরূপ এবং বিজ্ঞান - আবুল হোসেন খোকন ৩৩১-৩৩৮
ধর্ম না কি বিজ্ঞান ? - আকাশ মালিক ৩৩৯-৩৪২
ধর্মগ্রন্থাদিতে বিজ্ঞানের আভাস ? - ড. অভিজিৎ রায় ৩৪৩-৩৬০

চতুর্থ অধ্যায় : বিজ্ঞান ও অপবিজ্ঞান

- বিজ্ঞান-অপবিজ্ঞান, কোথায় সীমারেখা ? - জাহেদ আহমদ ৩৬৩-৩৭৯
বিজ্ঞান, ধর্ম ও বিশ্বাস - অপার্টিব জামান ৩৮০-৩৮৬
নিম্ন গাছে আমের সন্ধান-নাস্তিকের ধর্মকথা ৩৮৭-৩৯৬

পঞ্চম অধ্যায় : নৈতিকতা ও মূল্যবোধ বনাম নাস্তিকতা

- নৈতিকতা-বেহেস্তে যাওয়ার ছাড়পত্র ? - ড. অভিজিৎ রায় ৩৯৯-৪২১
হতবুদ্ধি, হতবাক! - ড. মীজান রহমান ৪২২-৪৩৭
আমাদের মূল্যবোধ কি ঈশ্বরের দান ? - ড. ভিক্টর জে স্ট্রেঙ্গার ৪৩৮-৪৫৩
বিবর্তনের দৃষ্টিতে নৈতিকতার উদ্ভব - অপার্টিব জামান ৪৫৪-৪৬০
স্বার্থপর জিনের আলোকে সহযোগিতা এবং আত্মত্যাগ
- দিগন্ত সরকার ৪৬১-৪৭১
প্রসঙ্গ-নৈতিকতা - পুরঞ্জিৎ সাহা ৪৭২-৪৭৪
নাস্তিকতার বিরুদ্ধে কিছু মিথ - ড. স্যাম হারিস ৪৭৫-৪৭৮

- পরিশিষ্ট: ১ : 'মুক্ত আলোচনা আস্তিকতা বনাম নাস্তিকতা'র প্রত্যুত্তরে ৪৭৯-৪৯৪
পরিশিষ্ট: ২ : গ্রান্ড ডিজাইন-ঈশ্বরবিহীন মহাবিশ্বের রূপরেখা, একটি পর্যালোচনা
- ড. অভিজিৎ রায় ও ড. অজয় রায় ৪৯৫-৫১৮

লেখক পরিচিতি ৫১৯-৫২৩

আমাদের কথা

মানব সভ্যতা-সংস্কৃতির বিকাশ ও অগ্রগতির সাথে সাথে এক পর্যায়ে পৃথিবীর নানা দেশে প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রত্যাদিষ্ট একেশ্বরবাদী ধর্মের উন্মোচন ঘটে মাত্র কয়েক হাজার বছর আগে। এ ধরনের ধর্ম প্রধানত তিনটি—পুরাতন গ্রন্থ ভিত্তিক মূলত মুসা নবী প্রবর্তিত ইহুদী ধর্ম, নতুন গ্রন্থ (বাইবেল) ভিত্তিক যিশুর খ্রীস্ট ধর্ম সর্বশেষে কোরান ভিত্তিক, পয়গম্বর হযরত মুহম্মদ প্রবর্তিত ইসলাম ধর্ম। কিন্তু এরও আগে খ্রীস্টের জন্মের অনেক অনেক বছর আগে চন্দ্র-সূর্যসহ বহু প্রাকৃতিক শক্তির প্রতীক রূপী অসংখ্য দেব-দেবী ভিত্তিক ধর্মের বিকাশ ঘটেছিল প্রাচীন মিশরীয়, গ্রীক, রোমক, এবং চৈনিক-পারসিক-ভারতীয় সভ্যতায়। মিশর, পারস্য ও ভারতে অগ্নি ও সূর্য পূজিত হতেন প্রধান দেবতা হিসেবে। এছাড়াও ভারতের বৈদিক ধর্মে, পরবর্তীকালে যা হিন্দুধর্মে রূপান্তরিত হয় নানা সংঘাত সংশ্লেষণের মধ্য দিয়ে, বরুণ, ইন্দ্র, পবন, উষা, সাবিত্রী, এবং পৌরাণিক বিষ্ণু, ব্রহ্মা, মহেশ্বর, দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী প্রভৃতি নানা দেব-দেবীর উদ্ভব ঘটে। গ্রীক ও রোমক মিথোলজির দেব-দেবীর কথা আমাদের অল্প বিস্তর জানা আছে। এরও লক্ষ্যধিক বছর আগে প্রাচীন নিয়ানডার্ভাল প্রজাতির মানবের মধ্যেও ধর্মীয় ও আধ্যাতিক চেতনার উন্মোচন ঘটেছিল বলে নৃতত্ত্ববিদগণ প্রমাণ পেয়েছেন। কিন্তু আবার এও সত্য দেবতা-ঈশ্বর অনস্তিত্ব ধর্মও বিকাশ লাভ করেছে প্রাচীন পৃথিবীতে—চীনে তাওধর্ম, কনফুসিয়াসীয়বাদ, ভারতে কপিল প্রবর্তিত সংখ্যা পদ্ধতি, মহাবীর প্রবর্তিত জৈন এবং গৌতম বুদ্ধের ধর্ম, ও চার্বাকের লোকায়তধর্ম যা প্রকারান্তরে নাস্তিকতারই নামান্তর।

সভ্যতার ক্রম বিকাশে ইতিহাসের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় পর্বে মানুষের জীবনে ধর্ম পালন করেছে এক কঠোর, নৈষ্ঠিক ও নিয়ন্ত্রণকারী অনন্য ভূমিকা। মানুষের নানা জিজ্ঞাসার আশ্রয়স্থল ছিল ধর্মগ্রন্থ ও শাস্ত্রাদি, মানুষকে নৈতিকভাবে, সামাজিকভাবে এমন কি সংস্কৃতিগতভাবে অনুশাসন করত ধর্মগ্রন্থাদি। শুধু পরলোকে নয়, ইহলোকে জীবনানুচারণ, আইন-কানুন, সমাজের ক্রিয়া-কারণ সবই নিয়ন্ত্রণ করত ধর্মগ্রন্থগুলি। আচার আচারণের তিলমাত্র এদিক-ওদিক হলে ধর্মের রক্ষক বিভিন্ন চাট্টায় প্রতিষ্ঠান ও মোল্লা-পুরোহিত দল হৈ হৈ রৈ রৈ করে উঠত, নিরীহ মানুষ, এমন কি বিদগ্ধ বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায় নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গও রেহাই পেত না পুরোহিত তন্ত্রের নিষ্পেষণ-কল থেকে। কিন্তু ইতিহাস সেখানেই থেমে থাকে নি, ইউরোপে

রেনেসাঁর পথ ধরে ঘটল শিল্প-বিপ্লব, সামন্ততন্ত্র ভেঙে গড়ে উঠল পুঁজিবৃত্তিক নতুন ধনব্যবস্থা, রাষ্ট্র থেকে চার্চ আলাদা হয়ে উঠল, জ্ঞান-দর্শন-বিজ্ঞান চর্চা অনেকটাই হয়ে উঠল সেক্যুলার জিজ্ঞাসা-অনুসন্ধিৎসুভিত্তিক। ফলে ধর্ম থেকে রাষ্ট্রীয় আইন পেলো স্বতন্ত্র মর্যাদা এবং অনেকটা সেক্যুলার ভিত্তিক। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে ধর্মবাদীরা মানুষের জীবনের ওপর অধিকার হাতছাড়া করেছে বরং তাদের অনুশাসন ও নিয়ন্ত্রণ বজায় রেখেছে নানা ছলে, কখনও নৈতিকতার দোহাই পেড়ে, কখনও পরলোকের শাস্তির ভয় দেখিয়ে, কখনও বা বেহেস্তের অনন্ত-অনির্বচনীয় সুখ-ভোগের লোভ দেখিয়ে। যুক্তিহীন সরল মানুষ সহজেই এদের মোহে ও ভয়ে নিমজ্জিত হয়েছে, বিনা প্রতিবাদে মেনে নিয়েছে মোল্লা-পাদ্রী-পুরোহিতের আশুবাণ্য ও নির্দেশনা। এমন কী অনেকক্ষেত্রে ধর্মবাদী ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলো রাষ্ট্রীয় আইনকেও বৃদ্ধাস্থল প্রদর্শন করেছে। বাংলাদেশে ফতোয়াবাজী ও তৎপ্রদত্ত বিচারের বাস্তবায়ন, আহমেদীয়া মসজিদ ভেঙে সুল্লি মসজিদ বানানোর চেষ্টা, এবং পাকিস্তানে ব্লাসফেমি আইনের বলে অবিশ্বাসীদের হত্যা করা—এর সামান্য উদাহরণ মাত্র। রাষ্ট্র প্রশাসন বেশির ভাগ সময় নির্লিপ্ত বা নিষ্ক্রিয় থাকে।

কিন্তু এর মধ্যেও, ধর্মের দোঁর্দণ্ড প্রতাপকালেও, পৃথিবীর অনেক বিদগ্ধ চিন্তাশীল মানুষ বিভিন্ন সময়ে জ্ঞান চর্চা করেছে, ধর্মীয় অনুশাসনকে অতিক্রম করে—জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনায় নিয়োজিত ছিলেন: উদাহরণ স্বরূপ গ্রীক-আয়োনিয় এবং আলেকজান্দ্রীয় (মিশরীয়) বিজ্ঞানীবৃন্দ—থালেস, অ্যানাক্সিমান্ডার, অ্যানাক্সিমেনেস, পিথাগোরাস, অ্যানাক্সাগোরাস, ডিমোক্রিটাস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল, হেরাক্লিডিস, টলেমী,... ইউক্লিড, আর্কিমিডিস প্রমুখদের নাম করতে পারি; উল্লেখ করতে পারি ভারতীয় পণ্ডিতজনের কথাও যেমন—চরক, সুশ্রুত, আর্ষভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত, বরাহমিহির, ভাস্কর প্রমুখ। নাম করতে পারি প্রাচীন রোমক বিজ্ঞান সাধকদের কথা—পোসিডেনিয়াস, জেমিনাস, নিকোমেকাস, ডায়োফেণ্টাস, প্যাপাস, হাইপেসিয়া, বেয়েথিয়াস সহ অনেকেরই। এমন কি ইসলামী জগতের মহাপণ্ডিতেরা, ইসলামের কড়া নিষেধাজ্ঞা, নিয়ন্ত্রণ ও অনুশাসনকে অবজ্ঞা করে, ইউরোপ যখন জ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন, সে সময় জ্ঞানের প্রদীপ শুধু জ্বালিয়ে রাখেন নি জগৎকে বিজ্ঞান চর্চায় এগিয়ে নিয়েছিলেন—আল খোয়ারিজমি, আল বাত্তানি, ইবনে আল হাইথাম, আল বীরুনী, ওমর খৈয়াম, আল জারকালি, আত তুসি, আল রাজি, ইবনে সিনা, ইবনে রুসদ, ইবনে খালিদ, যিরহাম, আল দামিস্কি...; এদের অনেকেই 'মুতাজ্জিলা' বা মুক্তবুদ্ধির মানুষ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু কউর ইসলামপন্থীরা এদেরকে

‘মুরতাদ’ আখ্যা দিতে পিছপা হন নি ও এই মুক্তচিন্তা ধারক ও জ্ঞানসাধকদের অনেকেই মৌলবাদীদের হাতে নিগৃহীত ও লাঞ্চিত হয়েছিলেন, এমনকি অনেককে হত্যাও করা হয়েছিল।

অন্ধকার যুগ পেরিয়ে, এরই পথ ধরে পরবর্তীকালে জন্ম নিল ইওরোপীয় বিজ্ঞান—লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি, নিকোলাস কোপার্নিকাস, টাইকো ব্রাহে, জোহান কেপলার, ফ্রনো, গ্যালিলিও গ্যালিলি, এড্রিয়া ভেসালিয়াস, উইলিয়াম গিলবার্ট, মাইকেল সেভেটার্স, হিরোনিমাস ফ্যাব্রিসিয়াস, উইলিয়াম হার্ভি, প্যারাসেলসাস, ভ্যান হেলমন্ট, জর্জিয়াস এগ্রিকোলা, বেকন, দেকার্ত... প্রমূখ বিদ্বজনের হাতে তত্ত্ব ও পর্যবেক্ষণ নির্ভর আধুনিক বিজ্ঞান গড়ে উঠল, জন্ম নিল নিউটনের মত প্রতিভা যার মেধায় ও মননে পরিপূর্ণতা পেল বিশ্লেষণ ধর্মী তত্ত্বগত এবং পরীক্ষণ বিজ্ঞান এবং সত্য আবিষ্কারের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির হল বিকাশ জেনেটিক তত্ত্বের পথপ্রদর্শক মেডল ও বিবর্তনবাদের প্রবর্তক ডারউইন আবির্ভূত হয়েছেন জীব বিজ্ঞানের আধুনিক গবেষণায় দিক-নির্দেশক রূপে। কিন্তু এ পর্যায়ে আসতে গিয়ে ধর্মবাদী চার্চ, ইসলামী মোল্লাদের হাতে অত্যাচারিত-নিগৃহীত বা দেশত্যাগী হতে হয়েছে এনাক্সোগোরাস, গ্যালিলিও, প্যারাসেলসাস, ওমর খৈয়াম, আল বীরুনী, ইবনে সিনা প্রমূখ সত্যসাধকদের,... আর্যভট্ট, বরাহমিহির’দের ধর্মবিরোধী বিজ্ঞান-মতবাদ প্রকাশের কারণে শাস্ত্রকারদের কাছে পেতে হয়েছিল ভর্ৎসনা,—মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে ফ্রনো এবং হাইপেসিয়া’র মত গবেষকদের তথা কথিত ধর্মবিরোধী জ্ঞান সাধনার অপরাধে।

আজকের দিনে পরিবর্তিত অনেক উদারনৈতিক পরিবেশে বিজ্ঞানীদের ওপর এত ঢালাওভাবে শারীরিক নিগ্রহ না করা হলেও ধর্মবাদীরা সুযোগ পেলেই এখনো বিজ্ঞানের অগ্রগতি ঠেকাতে মুখিয়ে থাকে। যখনই বিজ্ঞানের কোন নতুন আবিষ্কার স্ব-ধর্মগ্রন্থের বিশ্বাসের বিপরীতে যায় তারা বিজ্ঞানকে নস্যাৎ করতে চান এই বলে যে বিজ্ঞানের তত্ত্বে ভুল আছে, বিজ্ঞানের উপাত্ত বিশ্লেষণে ত্রুটি রয়েছে। অথবা ধর্মগ্রন্থের নতুন ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়ে দাবী করতে থাকেন যে এসব কথা তো ‘আমাদের পবিত্র গ্রন্থেই রয়েছে, এ আর নতুন কী?’ এখনও ধর্মবাদীরা বিজ্ঞানের মুক্ত গবেষণা বিরোধী মনোভাব পোষণ করেন, মুক্তবুদ্ধির চর্চাকে ধর্মদ্রোহীতা মনে করেন, আর সুযোগ পেলেই মুক্তবুদ্ধির অনুসারী কবি, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, সাহিত্যিকদের ‘মুরতাদ’ আখ্যা দিয়ে সমাজে তাদের অপাংক্তেয় করে তোলার প্রয়াস পান; এমন কি ধর্মাত্ম জঙ্গীরা তাদেরকে শারীরিকভাবে আঘাত করতেও পেছপা হয় না, নতুবা দেশত্যাগে তাদের বাধ্য করে, দণ্ডদেশ ঘোষণা করে—মাথার মূল্য

নির্ধারণ করে জঙ্গীদের তা বাস্তবায়নের জন্য অনুপ্রাণিত করে থাকেন ধর্মবাদীরা। আবার উন্নতদেশগুলিতে, বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রে, চার্টসমূহ বা ধর্মীয় সংস্থাগুলি সরকারকে স্ব-প্রণোদিত হয়ে নির্দেশ দেয় এবং চাপ সৃষ্টি করে কোন কোন বিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণা করা যাবে, আর কোন কোন বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে হবে। তারা নির্দেশ দেয় শিক্ষালয়গুলিতে বিবর্তনবাদের পাশাপাশি তথাকথিত বৈজ্ঞানিক সৃষ্টিতত্ত্ব ও ধর্মীয় সৃষ্টিতত্ত্বও পড়াতে হবে। এ থেকে মনে হয় পোপ পলের (২য়) প্রকাশ্য ঘোষণা সত্ত্বেও ধর্মবাদীরা বিবর্তনবাদকে মেনে নিতে পারে নি। তাই ধর্ম প্রতিষ্ঠানগুলির এ ধরনের অপতৎপরতা। বাংলাদেশে স্কুল কলেজের জীববিদ্যার পাঠ্যসূচীতে বিবর্তনবাদের স্থান নেই। এমন কী বিশ্ববিদ্যালয় স্তরেও ‘বায়োটেকনলজি ও জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং’ অন্তর্ভুক্ত হলেও এর ভিত্তিমূল আধুনিক বিবর্তনবাদকে সুকৌশলে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করা হয়। কী আশ্চর্য!

আধুনিক কালে বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে এ হেন সম্পর্ক বিদ্যমান থাকলেও বিজ্ঞান সাধনা ছাড়া যে আধুনিক রাষ্ট্র সমাজ অচল সে কথা দিবালোকের মত সত্য। তাই বিজ্ঞান বিবর্জিত সমাজ কষ্টকল্পিত, এমন কী উদারমনা ধর্মবাদীরা ও ধর্ম-বিজ্ঞানের মধ্যে সহ-অবস্থানের প্রবক্তারাও চাইবেন না বিজ্ঞান-প্রযুক্তির গবেষণা ও চর্চা নিষিদ্ধ হোক। এতদসত্ত্বেও আমরা মনে করি বর্তমানে সমাজে ধর্মের একটা বড় ভূমিকা থাকতে পারে। অতীতকাল থেকেই রাষ্ট্রে, সমাজে, সংস্কৃতিতে ও আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ধর্ম বড় ধরনের প্রভাব বিস্তার করে আছে। ধর্ম-নির্ভর অনুষ্ঠানগুলো (ঈদ, পূজা, বড়দিন ইত্যাদি) আমাদের বৃহত্তর সংস্কৃতির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। ব্রহ্মগীতি, কীর্তন, ভজন, বৈষ্ণব সঙ্গীত, রামপ্রসাদী, শ্যামাসঙ্গীত, লালন গীতি, কাওয়ালী, গজল—এসব তো আমাদের সঙ্গীতের শ্রেষ্ঠসম্পদ। আমাদের একথাও ভুলে গেলে চলবে না, বাংলাদেশ তো বটেই, পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ কোন কোন ধর্মের অনুসারী। তাই সমাজ ও ইতিহাসের অগ্রগতির ধারাকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ধর্মের ভূমিকাকে গুরুত্বের সাথে অনুধাবন করতে হবে। মানুষ কেন বিশ্বাসী হয়, এ প্রশ্নের বৈজ্ঞানিক জবাব আমাদের নির্মোহভাবে বিশ্লেষণ করে বের করতে হবে। প্রশ্ন করা যায়, বিশ্বাস কী তবে মানব মনে প্রোথিত ছিল মানব বিবর্তনের আদিস্তরেই যা জেনেটিকের মাধ্যমে বহমান প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে? সমাজ ও জীবন বিবর্তনের ধারায় টিকে থাকার সংগ্রামে ‘বিশ্বাস’ নামক অনুভূতিটি কী কোন বাড়তি উপযোগিতা তৈরি করেছিল? আবেগ দিয়ে নয়, বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠা ও বিশ্লেষণের পথ ধরেই আমাদের এর উত্তর পেতে হবে। এই বই-এর অনেক

লেখক আধুনিক গবেষণা এবং তথ্যের ওপর ভিত্তি করে তাঁদের প্রবন্ধে এ ধরনের সমস্যার সমাধান খুঁজেছেন।

আধুনিক বিজ্ঞানের এই অবিশ্বাস্য প্রগতিতে অনেক মনীষীদের মধ্যে প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে বিজ্ঞান যেখানে আমাদের মহাবিশ্ব সংশ্লিষ্ট ও জীবময় জগতের প্রায় সকল প্রশ্নের উত্তর ক্রমশ পেয়ে যাচ্ছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে ধর্ম এবং দর্শন কী জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে অপ্রাসঙ্গিক ও অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে না? এর উত্তরও আমরা খোঁজার চেষ্টা করেছি গ্রন্থটির মাধ্যমে। ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে এই যে চিরন্তন দ্বন্দ্ব বা সংঘাত চলে আসছে সভ্যতার উষালগ্ন থেকে এর কি অবসান ঘটবে না, অনেকেই মনে করেন বিজ্ঞান ও ধর্মের পথ ভিন্ন—দুয়ের মেলার কোন অবকাশ নেই, এই দুটি শৃঙ্খলা স্বতন্ত্র দুই জগতের বাসিন্দা, আবার অনেকে মনে করেন বিজ্ঞান ও ধর্মের আপাত সংঘাত থাকলেও—এদের মধ্যে পুরোপুরি সমন্বয় সাধিত না হলেও সহনশীলতার মধ্য দিয়ে দুয়ের মধ্যে সহাবস্থান সম্ভব, যেমন আপাত বৈসাদৃষ্ট বিভিন্ন ধর্মের সহ অবস্থানকে বিশ্ব সমাজ মেনে নিয়েছে।

২০০১ সালে ইন্টারনেট পদ্ধতি চালু হওয়ার পর পরই বহু চিন্তা-ভাবনা-ধারণা জাগানিয়া প্রবন্ধ ও লেখায় সমৃদ্ধ হতে থাকে ‘মুক্তমনা’ নামের আমাদের এই সাইবারনেট ভিত্তিক মঞ্চটি। এ থেকেই বাছাই করা লেখাসমষ্টি নিয়ে এই প্রবন্ধ সঙ্কলনটির প্রথম খন্ড প্রকাশিত হচ্ছে। এছাড়া আমাদের আমন্ত্রণেও অনেকে লেখা পাঠিয়েছেন তা থেকেও কিছু প্রবন্ধ এখানে স্থান পেয়েছে। বাকি লেখাগুলি নিয়ে, ইচ্ছে আছে ২য় খণ্ডটি প্রকাশের—পরবর্তীকালে।

এই সঙ্কলনটির মাধ্যমে বিজ্ঞান মাধ্যমে বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যকার সম্পর্ক খোঁজা, জানা, এবং বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে নির্মোহ দৃষ্টিতে মূলতঃ একাডেমিক বা বুদ্ধিবৃত্তিক যুক্তিবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে। আমরা ব্যবহার করেছি দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব-তথ্য-পর্যবেক্ষণ-উপাত্ত সমূহ বিশ্লেষণে-ব্যাখ্যায়। সন্দেহ নেই বিজ্ঞান এবং ধর্ম—দুটিরই প্রভাব ও গুরুত্ব মানুষের জীবনে, সংস্কৃতিতে, জীবনাচারে অপরিসীম। কিন্তু এ দুয়ের মধ্যে সম্পর্কটি ঠিক কেমন? গ্রন্থের লেখকরা তাঁদের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা এবং আধুনিক গবেষণালব্ধ সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে এটির সন্ধান করার প্রয়াস পেয়েছেন। তিনভাবে এদের মধ্যকার সম্পর্কটিকে বিবেচনা করা যেতে পারে।

প্রথম মত অনুযায়ী, বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব বা বিরোধ নেই। সর্বজ্ঞ এক স্রষ্টার ইচ্ছেতেই তৈরি হয়েছিল এই মহাবিশ্ব, মনুষ্যসহ প্রাণীজগৎ, আর তাঁরই নির্দেশে সব কিছু চলছে। এই মতের অনুসারীরা মনে করেন বিজ্ঞানের নিত্য নতুন আবিষ্কারগুলির কথা বা ইঙ্গিত স্রষ্টা পূর্ব থেকেই ধর্মগ্রন্থগুলিতে দিয়ে রেখেছেন। বিজ্ঞানীদের কাজ কেবল তার পুনরাবিষ্কার করা বিশদভাবে ব্যাখ্যাসহ। এঁরা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে দেখেন একটি জটিল কল বা মেশিন রূপে, এবং ঈশ্বর হলেন এই মেশিনের মেকানিক বা যন্ত্রী। বিজ্ঞানীরা এই মহা-কলের কাজ ও তার পেছনে কার্যকর সূত্রসমূহ আবিষ্কার করতে পারেন এবং বুঝতে পারেন, কিন্তু যন্ত্রীর স্বরূপ ও প্রকৃতি ধরতে পারেন না। অর্থাৎ ঈশ্বর নামক সৃষ্টিকর্তা দুর্জয় ও রহস্যময়ই থেকে যান বিজ্ঞানীদের কাছে কারণ ধর্মবৈত্তার বলেন যে ঈশ্বর নামক সত্তাটি স্থান-কালে আবদ্ধ নন এবং কোন প্রকৃতিক আইনসমূহকে দিয়ে তাঁকে ধরা ছোঁয়া যাবে না, অর্থাৎ তিনি হলেন মনুষ্যজ্ঞানাতীত। এই মনোভাব সুন্দরভাবে লোক কবি আবদুর রহমান বয়াতির গানে ধ্বনিত হয়েছে : ‘...মন আমার দেহ ঘড়ি, সন্ধান করি... কোন মিস্তরী বানায়েছে...।’

দ্বিতীয় মতের অনুসারীরা মনে করেন, বিজ্ঞান ও ধর্মের মধ্যে সুস্পষ্ট দ্বন্দ্ব ও বিরোধ রয়েছে। এ দুয়ের মধ্যে সমন্বয়ের প্রচেষ্টা অর্থহীন, বিভ্রান্তিকর এবং অসম্ভব বলে এঁরা মনে করেন। এঁদের মতে পৃথিবী, গ্রহ, নক্ষত্র... এক কথায় মহাবিশ্ব ও প্রাণের উন্মোচন সম্পর্কে ধর্ম গ্রন্থগুলির প্রাচীন ব্যাখ্যা ও অভিমতকে বিজ্ঞান যুগে যুগে ভুল প্রমাণ করেছে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে—যেমন পৃথিবীর বয়স, ভূকেন্দ্রিক তত্ত্ব, সৃষ্টি সম্পর্কে আজগুবি কেচ্ছা-কাহিনী ইত্যাদি। তাঁরা মনে করেন আধুনিক বিজ্ঞান সৃষ্টিকর্তা ছাড়াই মহাবিশ্বের উদ্ভব ও অস্তিত্বকে আজ ব্যাখ্যা করতে পারে। সৃষ্টিকর্তার ধারণাকে দার্শনিকভাবেও ভ্রান্ত বলে তাঁরা মনে করেন, কারণ সব কিছুর পেছনে একজন সৃষ্টিকারী থাকলে, সেই সৃষ্টিকর্তা কোথেকে এলেন সেটাও বলতে হবে। ফলে আমরা একটি সীমাহীন সিরিজে উপনীত হতে বাধ্য হই। বস্তুত পবিত্র গ্রন্থগুলিতে কোন বিজ্ঞানের তত্ত্ব নেই, তথ্যও নেই—থাকার কথাও নয়; এমন কি সেই সময়ের বৈজ্ঞানিক ধারণাগুলিকেও সঠিকভাবে উপস্থিত করা হয় নি। তাই ধর্মের কাছে বিজ্ঞানের কখনও দ্বারস্থ হতে হয় না, বরং ধর্মবাদীরাই আজ প্রতিটি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের পর নিজ নিজ ধর্মগ্রন্থের সাথে এই তথ্যকে জুড়ে দিতে প্রয়াস পান। কারণ ধর্মবাদীরা জেনে গেছে যে ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান ঠিকই টিকে থাকতে পারে, কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে ধর্ম আধুনিক বিশ্বে টিকে থাকতে পারবে না।

তৃতীয়তঃ আরও একটি মত আছে যাকে বলা হয় ‘স্বতন্ত্র বলয় তত্ত্ব’। এর অনুসারীরা মনে করেন বিজ্ঞান এবং ধর্মের অবস্থান পরস্পর বিচ্ছিন্ন দুটি স্বতন্ত্র জগতে বা বলয়ে। অর্থাৎ বিজ্ঞান ও ধর্ম দুটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয় নিয়ে কাজ করে। বিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক সূত্রের সাহায্যে প্রাকৃতিক জগৎকে ব্যাখ্যা করে, আর ধর্ম অতিন্দ্রীয় লোক, নৈতিকতা এবং মূল্যবোধের চর্চা করে—এর আলোকে সমাজ নির্মাণ করতে চায়। সহজ কথায় বিজ্ঞানের কাজ কর্ম যন্ত্রপাতির মাধ্যমে পরিমাপযোগ্য যা আমাদের যৌক্তিক এবং বৌদ্ধিক জ্ঞানকে প্রতিনিয়ত প্রসারিত ও ত্বরান্বিত করছে; আর ধর্মের কাজ মানুষের আত্মিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধন। যতক্ষণ বিজ্ঞান ও ধর্ম পরস্পর আলাদা কক্ষে অবরুদ্ধ থাকে ততক্ষণ ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব থাকে না। ঝামেলা লাগে যখন এই দুই বলয়ের অধিবাসীরা একে অপরের সীমারেখাকে অতিক্রম করে অন্যের জগতে অনুপ্রবেশ করতে চায়। যেমন বিজ্ঞানীরা যখন আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে চায় বা এর ওজন পরিমাপ করতে লেগে যায়, কিংবা ধর্মবাদীরা যখন ‘সৃষ্টিতত্ত্বকে’ কিংবা ‘বুদ্ধিদীপ্ত অনুকল্প’কে বিজ্ঞান নামে অভিহিত করে পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করতে চান...। এই মতবাদের ধারকরা মনে করেন ধর্ম ও বিজ্ঞানকে আলাদা বলয়ে আটকে রাখতে পারলেই তাদের মধ্যে সংঘাত এড়ানো যাবে। এই স্বতন্ত্র বলয় তত্ত্বকে ইংরাজিতে নাম দেয়া হয়েছে ‘নন ওভারল্যাপিং ম্যাগেস্টেরিয়া’ (Non Overlapping Magisteria)। বিখ্যাত বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানী স্টিফেন জে গুল্ল হলেন এই তত্ত্বের প্রবক্তা—তিনি তার সদ্য প্রকাশিত ‘রকস অব এজেন্স’ শিরোনামের পুস্তকটিতে ধর্ম ও বিজ্ঞানের সংঘাত এড়াতে এই মতবাদ উপস্থাপন করেন। শর্ত এই ধর্ম তার জগৎকে অতিক্রম করে বিজ্ঞানের রাজ্যে অনুপ্রবেশ করবে না, বিজ্ঞানও তেমনি ধর্মের জগতে প্রবেশ করবে না তার কৌতুহল মেটাতে।

ধর্ম-বিজ্ঞান সম্পর্ক নিয়ে উল্লিখিত তিনটি দৃষ্টিভঙ্গির পক্ষ-বিপক্ষে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ সঞ্চলনটিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এ ছাড়াও এসেছে নানা বৈচিত্রের অনেক প্রবন্ধ। বিজ্ঞান কি ঈশ্বরকে পেয়ে গেছে? কিংবা মহাবিস্ফোরণ, সূক্ষ্ম-সমন্বয়, নরপ্রতিম যুক্তিগুলি (anthropometric arguments) কি প্রস্তার অস্তিত্বের পক্ষে আদৌ কোন যৌক্তিক প্রমাণ? এ নিয়ে কয়েকটি প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে। প্রায়শ বলা হয়ে থাকে রহস্যময় এক ‘অদ্বৈত বিন্দু’ (Singularity) থেকে মহাবিস্ফোরণের (Big Bang) ফলে এই মহাবিশ্বের উদ্ভব ঘটেছে; কিন্তু এ বিস্ফোরণের আগে কী ছিল, কেনই বা মহাবিস্ফোরণ ঘটেছে, —বিজ্ঞান নাকি এ ধরনের প্রশ্নের কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে অক্ষম। তাই অনেকে বিশ্বসৃষ্টির পেছনে কোন

অলৌকিক সত্ত্বার হাত রয়েছে বলে ইঙ্গিত দেন। কিন্তু এই অনুমানের পশ্চাতে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ ও যুক্তি কেউ প্রদর্শন করতে পারেন না। এই সত্ত্বাকেই তারা নাম দিয়েছেন সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান ঈশ্বর—যিনি স্বয়ম্ভু তাঁর অস্তিত্বের পেছনে কোন ‘কারণ’ থাকার প্রয়োজন নেই ধর্মবাদীরা মনে করেন এই ঈশ্বর পাপপুণ্যের জন্য শাস্তি ও পুরস্কার দেন, ভক্তের প্রার্থনায় সাঁড়া দেন—এক কথায় তাঁকে ব্যক্তি ঈশ্বরে পরিণত করা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, এ ধরনের কাজ কর্ম তিনি কি করতে পারেন বা প্রার্থনা পূরণ করে থাকেন এর পক্ষে বস্তুনিষ্ঠ প্রমাণ নেই। মহান সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা ছাড়া যদি কিছুই ঘটবার উপায় না থাকে তাহলে পাপপুণ্যের সকল দায়ভার কেন অসহায় মানুষকে বহন করতে হবে? এটিও সমান যৌক্তিক প্রশ্ন—যা প্রতিটি যুগের চিন্তাশীল মানুষকে, দার্শনিককে, বিজ্ঞানীকে ভাবিয়ে তুলেছে। সর্বজ্ঞ পরম দয়ালু ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই যদি জগৎ তৈরী হয়ে থাকে, তাহলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে, দুর্ভিক্ষে, মহামারীতে লক্ষ লক্ষ প্রাণহানির দায়-দায়িত্ব ঈশ্বর নেবেন না কেন—নিজের সৃষ্টি নিয়ে এ ধরনের ‘তাঁর খেলা’—এই যে লক্ষ কোটি মানুষের মৃত্যু, কিংবা ইতিহাসের পথ পরিক্রমায় কোটি কোটি প্রজাতির বিলুপ্তি তাঁর সৃষ্টির ‘সূক্ষ্ম সমন্বয়’ (Fine tuning) অথবা ‘বুদ্ধিদীপ্ত পরিকল্পনার’ (Intelligent Design) দিকে নির্দেশ করে? এ বিষয়গুলি নিয়ে প্রাণবন্ত আলোচনা ছাড়াও পুস্তকটিতে এসেছে মহাবিশ্ব, বুদ্ধিদীপ্ত পরিকল্পনা, ধর্মনিরপেক্ষতা, ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা, এবং মৌলবাদ প্রসঙ্গ, ধর্মের উৎস-উদ্ভব, এবং অলৌকিকতার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান, ধর্ম ও নৈতিকতা প্রসঙ্গ, অজ্ঞেয়বাদ, সশংক্যবাদ, যুক্তিবাদ, আন্তিকতা-নাস্তিকতা... প্রভৃতি নানা ধরনের বিষয় নির্ভর আলোচনা গ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছে। পদার্থবিদ্যা, ও জীববিজ্ঞানের আধুনিকতম তত্ত্বাদি এবং তথ্যাদির অনুসন্ধান করা হয়েছে, নির্দেশ করা হয়েছে আধুনিকতম দার্শনিক চিন্তা-ভাবনা ও সমস্যাগুলির প্রতিও। নৈতিকতা, সমাজ নির্মাণের মূল্যবোধগুলি ঈশ্বর প্রদত্ত নাকি এর পেছনে বৈজ্ঞানিক ভিত্তি রয়েছে—এ প্রশ্ন নিয়েও অনেকে আলোচনা করেছেন একাডেমিক প্রেক্ষাপটে বিস্তৃতভাবেই। প্রবন্ধকারগণ নির্মোহ মন নিয়ে একাডেমিক দিক থেকে লিখেছেন—কারও বিশ্বাস বা মতামতকে আঘাত দেবার প্রবণতা তাঁরা যত্নের সাথে পরিহার করেছেন। প্রবন্ধে প্রকাশিত মতসমূহ অবশ্যই লেখকদের নিজস্ব—এর দায়ভাগ প্রকাশক বা সম্পাদকমণ্ডলীর উপর বর্তাবে না। আমাদের জানামতে বাংলা ভাষায় এ ধরনের চিন্তার উদ্রেককারী ও বুদ্ধিবৃত্তিক অনুসন্ধিৎসু গ্রন্থ এই প্রথম; বাংলাভাষী পাঠক-পাঠিকাদের মুক্ত মন নিয়ে গ্রন্থটি পাঠ করার অনুরোধ রইল।

এ ছাড়া স্টিফেন হকিং ও তাঁর সহকর্মী লিওনার্দ মোদিনোও লিখিত সম্প্রতি প্রকাশিত 'The Grand Design' পুস্তকটির আলোচনাও সংকলনটিতে স্থান পেয়েছে। হকিং ও তার সহকর্মী পুস্তকটিতে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন কীভাবে ঈশ্বরের হস্তক্ষেপ ছাড়াই কেবল মাত্র প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াতেই মহাবিশ্বের উদ্ভব সম্ভব—বলা যেতে পারে 'ঈশ্বরশূন্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ড'। চিন্তার উদ্বোধকারী নানা প্রবন্ধে বিজ্ঞান ও দর্শনের প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করেছেন আমাদের দেশের মুক্তবুদ্ধির চর্চাকারী খ্যাতনামা বিজ্ঞানী ও চিন্তাশীল শিক্ষাবিদেবরা এবং সেই সাথে অনেক পরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত মুক্তমনা লেখকেরা।

সংকলন গ্রন্থটি পাঠকদের ভাল লাগলে, এবং ধর্ম-বিজ্ঞান নিয়ে কৌতুহল ও অনুসন্ধিৎসা সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারলে আমাদের শ্রম সার্থক বিবেচিত হবে।

সম্পাদক মণ্ডলী

ঢাকা

১৪ই জানুয়ারি ২০১২